প্রশ্ন ঃ ২। নারীবাদের অর্থ কী? নারীবাদী চিন্তার বিভিন্ন রূপগুলি কী? (What is the meaning of Feminism ? What are the different forms of Feminism ?)

উত্তর ঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক বিপ্লবী ধারা গড়ে ওঠে। এই ধারা সংক্ষেপে নারীবাদ নামে পরিচিত। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে সুদীর্ঘকাল ধরে পুরুষ জাতির কর্তৃত্ব এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় ছিল। পুরুষের আধিপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুরুষের আধিপত্যকে শক্তিশালী করেছিল। বিক্ষিপ্তভাবে মানবসমাজের ইতিহাসে কোথাও কোথাও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বিরাজ করলেও নারীজাতির ওপর পুরুষ-জাতির আধিপত্যের ভিত্তিতেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল। এই লিঙ্গভিত্তিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হল নারীবাদ। **বন্দনা চ্যাটার্জি** তাঁর **'Woman and Politics in India'** গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, নারীবাদ হল এরূপ একটি শক্তি যা নারীজাতিকে একটি আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণিতে পরিণত করেছে। নারীবাদ হল এরূপ এক প্রত্যয় যেখানে মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা বিচারে লিঙ্গ বিবেচ্য হবে না। লিঙ্গ ভিত্তিক শোষনের বিরুদ্ধে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত মতবাদ হল নারীবাদ। ১৭৯২ সালে মেরি উলস্টোন ক্র্যাফট তাঁর **'Vindication of the Right of Women'** গ্রন্থে এর উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের দাবি গড়ে উঠলেও মতাদর্শ হিসেবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীবাদের উদ্ভব ঘটে।

নারীবাদ

নারীবাদী চিন্তার বিভিন্ন রূপ ঃ নারীজাতির অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলন হিসেবে নারীবাদের বিভিন্ন রূপ প্রয়োগ করা হয়।

(১) **চরমপন্থী নারীবাদ ঃ** বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশকে একাধিক মহিলা সংগঠন ও নারীবাদী চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে সমাজের সমস্ত প্রকার বিভাজনের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন হল মৌলিক এবং সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। মানবজাতির ইতিহাসে প্রায় সকল সমাজ হল পিতৃতান্ত্রিক। সমাজের শ্রেণি শোষণের চেয়েও কঠোর শোষণ হল লিঙ্গভিত্তিক শোষণ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা হল সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এবং একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে পুরুষেরা নারীজাতির ওপর শোষণ ও বঞ্চনা কায়েম করে। নারীবাদের এই ধারা দেশ, কাল, জাতি নির্বিশেষে নারীদের একটি পৃথক শোষিত বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই চিন্তাধারা চরমপন্থী নারীবাদ নামে পরিচিত। এই ধারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

(২) **সমাজবাদী নারীবাদ ঃ** নারীবাদী চিন্তার অন্য একটি রূপ হল সমাজবাদী নারীবাদ। নারীবাদের এই ধারাটি অনেকাংশে মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ধারা অনুযায়ী সমস্ত শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্যমূলক সমাজে পুরুষতন্ত্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নারীজাতির ওপর

শোষণ ও পীড়নের অন্যতম কারণ। মার্কসীয় দর্শন পুঁজিবাদী সমাজে নারীজাতির শ্রে... শোষণকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করলেও সমাজবাদী নারীবাদ মনে করে যে সমস্ত যুগেই শ্রে... শোষণের ন্যায় লিঙ্গভিত্তিক শোষণ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

(৩) **উদারনৈতিক নারীবাদ ঃ** চরমপন্থী নারীবাদ ও সমাজবাদী নারীবাদের ন্যায় না... সমাজের ওপর নির্যাতনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাঠামোগত বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দান করে না। উদারনৈতিক নারীবাদ নারী ও পুরুষের সামাজিকীকরণের পার্থক্য, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, শিক্ষা ও যুক্তিবাদের অভাব ইত্যাদির মাধ্যমে নারীজাতির অধীনতার দিকটি বিশ্লেষণ করে। এই ধারা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মতাদর্শের পরিবর্তন, আন্দোলন, সংস্কার, আইনব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। উদারনৈতিক নারীবাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এছাড়া ১৯৮০-র দশকে পরিবেশ সচেতন নারীবাদ নামে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। এই ধারা অনুযায়ী নারী ও প্রকৃতি উভয়েই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের অধীনে নির্যাতিত ও শোষিত হয়। এই ধারার প্রধান প্রবক্তা হলেন **ইউবোন**। পরিবেশ শোষণ ও নারী শোষণের প্রকৃতি প্রায় একই রকম। পরিবেশ নারীবাদ পুরুষ শাসিত সমাজে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সুরক্ষায় নারীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়।

নারীবাদী চিন্তার উপরিউক্ত তিনটি মূল ধারা ছাড়াও নারীবাদী চিন্তার প্রবক্তাগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে নারীবাদকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। *প্রথমত*, এই শ্রেণির চিন্তাবিদ মনে করেন যে পাশ্চাত্য সামাজিক রাজনৈতিক তত্ত্বে নারীবাদী বিশ্লেষণ ও ধারণাগুলিকে সচেতনভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এগুলি পুনরায় সংযোজন করা প্রয়োজন। *দ্বিতীয়ত*, কেউ কেউ মনে করেন যে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক তত্ত্ব পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। নারীসমাজের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং নতুন দৃষ্টিকোণে সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই প্রবক্তাদের মধ্যে **ক্লার্কের** নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নারীবাদের এক অংশ মনে করেন যে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে যে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে উপেক্ষা করে নতুন যুক্তিসংগত তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, নারীবাদ হল সমাজের পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। শ্রেণি ও অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও পুরুষতন্ত্র সামাজিক বৈষম্যের এক অন্যতম ভিত্তি। সুতরাং নারী ও পুরুষের মধ্যে এই কর্তৃত্ব ও বৈষম্যতার সম্পর্ককে বিলুপ্ত করতে হলে নারীজাতির তরফ থেকে এক স্বতন্ত্র আন্দোলন প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ ৩। *ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ওপর একটি টীকা লেখো।* (*Write a note on the empowerment of women in India.*)

উত্তর ঃ প্রাচীনযুগ থেকে শুরু করে সুদীর্ঘকাল ধরে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এবং ভারতবর্ষে নারীজাতি এক বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সমগ্র বিশ্বে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানেও নারীজাতির বিভিন্ন অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার,

শিক্ষা এবং সম্পত্তির অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের স্বতন্ত্র স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার ১৯৫২ হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত একাধিক আইন প্রণয়ন করেছে। বিবাহ-সংক্রান্ত আইন, পণপ্রথা বিরোধী আইন, নারী-পুরুষের সমান মজুরি-সংক্রান্ত আইন, উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আইন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে নারীর মুক্তির জন্য বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা, চাকুরি, রাজনৈতিক জীবন এবং সামাজিক জীবনে নারীদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। মহিলাদের স্বার্থকে ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে একাধিক সংগঠন গঠিত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে সমাজে নারীজাতির সমস্যা সমাধানে নারীরা বিশেষ ক্ষমতার দাবি রাখে। নারীজাতির তরফ থেকে এই অবস্থার পরিবর্তনকে মহিলাদের ক্ষমতায়ন হিসেবে গণ্য করা হয়।

ক্ষমতায়নের অর্থ

ভারতীয় সমাজে মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকটি কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা যায়।

প্রথমত, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীগণ নারীজাতির ক্ষমতায়ন ও মর্যাদার উন্নয়নে বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্রটি তুলে ধরেন। ভারতীয় সমাজে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিবিদ্যায়) ছাত্রীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটেছে। মহিলারা বর্তমানে উচ্চ ও সাধারণ বেতনসম্পন্ন কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক উপার্জনশীলতা মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলেছে। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রেও আর পুরুষের একাধিপত্য নেই।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদ, বিধানসভা ও পৌর এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট আসন (33%) সংরক্ষিত। রাজনীতি ও প্রশাসনের উচ্চপদগুলিতে মহিলাদের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত জীবনে সুযোগ-সুবিধার ফলে মহিলাদের বিরুদ্ধে সাবেকি মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং যুক্তিবাদের ফলে সমাজজীবনে মহিলারা এক বিশেষ অবস্থান অর্জন করছে। গ্রামাঞ্চলের মহিলারা অনেকাংশে সাবেকি মনোভাবাপন্ন হলেও প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বিবাহ ও জীবনসঙ্গী পছন্দের ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বাধীনতা লক্ষ করা যায়। চাকুরিরতা অথবা উপার্জনশীল মেয়েকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে এক স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। পাত্রী পছন্দের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অন্যতম বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পূর্বেকার তুলনায় মহিলা সর্বদা গৃহকর্মে ব্যস্ত নয়। বৃহত্তর জগতের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্পকলা, প্রযুক্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্যের পরিবর্তে মহিলাদের বিচরণ পরিলক্ষিত হয়।

■ **মূল্যায়ন ঃ** উপরিউক্ত আলোচনায় ভারতীয় সমাজে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অবস্থানের পরিবর্তনের দিকটি উল্লেখ করা হলেও ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের মহিলারা এখনও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের মর্যাদার আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর

নির্ভরশীলতা, পারিবারিক নির্যাতন, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের সমান উন্নয়ন ঘটেনি। ভারতীয় সমাজে এখনও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রেও লিঙ্গ-বৈষম্য রয়েছে। সুতরাং, ভারতের নারীজাতির প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য বৃহত্তর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ ৪। ***ভারতে নারী আন্দোলনের ওপর একটি টীকা লেখো। (Write a short note on the women's movement in India.)***

উত্তর ঃ আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য নারী ও পুরুষের সমস্ত ক্ষেত্রেই সমান মর্যাদা ও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। তথাপি ভারতে চিরাচরিত সামাজিক মূল্যবোধ নারীজাতিকে পুরুষের ন্যায় সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি। ১৯৭৪ সালে ভারত সরকারের এক প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে রাজনীতিতে মহিলারা অংশগ্রহণ করলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক হতে তারা এখনও পুরুষের কর্তৃত্বে পরিচালিত হন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলিতেও মহিলারা নেতৃত্ব অর্জন করতে পারেনি। তথাপি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মহিলারা আংশিকভাবে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে বিভিন্ন দিক থেকে সংযুক্ত হয়েছে।

ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকাকে দুটি পর্বে আলোচনা করা যায়।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে নবজাগরণ, উদারনীতিবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নারীজাতির মুক্তির জন্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এর ফলে ১৮২৯ খ্রিঃ সতীদাহপ্রথা বিলোপ আইন, ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতীয় মহিলারা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে বাংলায় কিছু মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই সমিতিগুলির নেতৃত্বে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নারীরা জড়িত ছিলেন। এঁদের মধ্যে নলিনী দত্ত, সরলা দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন ভারতে কয়েকটি মহিলা সংগঠনের মধ্যে উইমেনস্ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৯১৭, অল ইন্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স ১৯১৭ নারীর মুক্তির জন্য কর্মপন্থা স্থির করে। অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯১৭ সালে সরোজিনী নাইডুসহ চোদ্দোজন মহিলা প্রতিনিধি চেমস্‌ফোর্ড মিশনের নিকট ডেপুটেশন দেন। মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভোটাধিকারের দাবি পেশ করেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনের সময় নারীদের এক বিশাল অংশ সক্রিয়ভাবে যোগদান করে। এ. আর. দেশাই তাঁর **'Social Background of Indian Nationalism'** নামক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে ভারতীয় সমাজের সমস্ত স্তরের মহিলারা বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে যোগ দেন। মিছিল, মদের দোকানে পিকেটিং, জেল খাটা এবং অন্যান্য নির্যাতনের মুখোমুখি হন। সশস্ত্র সংগ্রামীদের মহিলারা সহযোগিতা করেন। বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, খবর দান ইত্যাদি সহযোগিতা করেন। এমনকি সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনেও মহিলাদের একাংশ যুক্ত ছিল।

এক্ষেত্রে কল্পনা দত্ত, কনকলতা বড়ুয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ সমাজে মহিলারা বিদেশি পণ্য বর্জন করে খাদি বস্ত্র পরিধান করেন। এছাড়া স্বাধীনতার প্রাক্কালে কয়েকটি জঙ্গি কৃষক আন্দোলনেও মহিলারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৫০), অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫১) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

এই আন্দোলনগুলিতে মহিলারা গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করেন। কেরালাতে যে শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয় সেখানেও মহিলাদের একাংশ অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনোত্তর পর্ব

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় সমাজে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সক্রিয়তা ছিল তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে মহিলারা শুধুমাত্র ভোটদান এবং বিচ্ছিন্নভাবে সমাজকল্যাণ কাজে সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু কিছু মহিলা সরকারি বিভাগে পদ অর্জন করলেও তাঁদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। **শ্রীমতি বন্দনা** চ্যাটার্জি তাঁর **'Women and Politics in India'** প্রবন্ধে এই নির্লিপ্ততার দিকটি উল্লেখ করেন।

পুনরায় বিংশ শতাব্দীর শেষে কয়েক দশকে লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে এক পৃথক নারীবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের ডাকে মহিলারা ব্যাপক সাড়া দেন।

পরিবেশ সুরক্ষা ও নারী আন্দোলন

এমনকি অর্থনৈতিক ও পরিবেশ সুরক্ষায় নারীরা এগিয়ে এসেছে। উত্তরপ্রদেশে চিপ্‌কো আন্দোলন, নর্মদা ভ্যালি আন্দোলন শুধুমাত্র নারী সমাজভিত্তিক আন্দোলন নয়—এগুলি বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এক্ষেত্রে মেধা পাটেকারের নাম উল্লেখযোগ্য।

বামপন্থী আন্দোলন

দেশের বামপন্থী আন্দোলনেও মহিলারা পিছিয়ে নেই। বামপন্থী সংগঠনগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত নারী সংগঠনের ভূমিকা অন্যতম।

প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অধিকাংশ নারী আন্দোলন মূলত পুরুষের নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মহিলারা সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ভূমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন।

ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন বিভিন্নভাবে সংঘটিত হলেও মহিলারা সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তথাপি দেশের বৃহত্তর পরিবর্তনে নারী-আন্দোলনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

প্রশ্ন ঃ ৫। *ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। (Make a short discussion on women's participation in Indian politics.)*

উত্তর ঃ সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সার্বিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গণত প্রকৃত রূপ লাভ করে। তথাপি বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সুদীর্ঘকাল ধরেই নারীজা ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজনীতিতে মহিলাদে অংশগ্রহণ নারীজাতির ক্ষমতায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজে মহিলাদের গুরুত্বের ক উল্লেখ করে **স্বামী বিবেকানন্দ** মন্তব্য করেন যে, *"Women constitute half of India teeming billion. Political participation is a vital link towards tota empowerment of women."*।

ভারতে স্বাধীনতার পূর্বে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য মহাত্মা গান্ধি এক ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় সংবিধান রচনার জ গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদে ৩৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন ছিলেন মহিল স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম কয়েক দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের ব্যাপ অংশগ্রহণ না ঘটলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি মহিলা ভোটকে সুরক্ষিত করার জ মহিলা সংগঠন গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় মহিলা কনফারেন্স এব ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কথা উল্লেখযোগ্য।

বিগত সাধারণ নির্বাচন ও মহিলাদের অংশগ্রহণ

ভারতীয় রাজনীতিতে বিগত ১৩টি লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের ফল বিশ্লেষ করলে দেখা যায় যে, মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিত্বের অনুপাত যথাক্রমে ৯৪ ঃ ১। লোকসভা মোট আসনে মহিলাদের শতকরা হার হল ৫ ঃ ১। কিন্তু মহিলা ও পুর ভোটদাতাদের অনুপাত প্রায় সমান। সুতরাং, নারী ও পুরুষের সম ভোটাধিকার থাকলেও নারীর পক্ষে সমান হারে আইনসভায় নির্বাচি হওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার ৪৯৯টি আসনের মধ্যে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হ ২২ জন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ৫০০ জনের মধ্যে ২৭ জন, তৃতীয় নির্বাচনে ৫০ জনের মধ্যে ৩৪ জন, চতুর্থ নির্বাচনে ৫২৩ জনের মধ্যে ৩১ জন, পঞ্চম নির্বাচনে ৫২ জনের মধ্যে ২২ জন, ষষ্ঠ নির্বাচনে ৫৪৪ জনের মধ্যে ১৯ জন (অর্থাৎ সবচেয়ে কম ৩. শতাংশ), সপ্তম নির্বাচনে ৫৪৪ জনের মধ্যে ২৮ জন, অষ্টম নির্বাচনে ৫৪৪ জনের মধ্যে ৪৪ জন (অর্থাৎ ৮.১ শতাংশ), নবম নির্বাচনে ৫১৭ জনের মধ্যে ২৭ জন, দশম নির্বাচনে ৫৪৪ জনের মধ্যে ৩৯ জন, একাদশ নির্বাচনে ৫৪৪ জনের মধ্যে ৩৯ জন ও দ্বাদশ নির্বাচনে ৫৪৩ জনের মধ্যে ৪৩ জন। ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ নির্বাচনে ৫৪৩ জনের মধ্যে ৪৯ জন অর্থাৎ এই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি মহিলা প্রতিনিধিত্ব করেন।

শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশেই কেন্দ্রীয় আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিদের গড় হার ১০ শতাংশ মাত্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ভারতে ১৯৯৩ সালে ৭৩ এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী পৌরসভা ও পঞ্চায়েতে $\frac{১}{৩}$ অংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। সারাদেশে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মহিলা সদস্য বিভিন্ন পদের দায়িত্ব পালন করছেন। পৌরসভাগুলিতেও মহিলারা কেন্দ্র এবং রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে রূপদান করছে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং রাজ্য আইনসভাতে মহিলাদের জন্য $\frac{১}{৩}$ অংশ আসন সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মহিলাদের অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটদাতাদের উপস্থিতি কম। তবে ১৯৮২, ১৯৮৭ এবং ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন থেকে দেখা যায় যে, ক্রমাগতভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষ ও মহিলা ভোটদাতার ব্যবধানের হার কমে আসছে—১৯৮২ সালে এই ব্যবধান ছিল ৪ শতাংশ; কিন্তু ১৯৯১ সালে তা প্রায় ২ শতাংশে নেমে এসেছে। মহিলা শিক্ষার প্রসার, মহিলাদের কর্মক্ষেত্রের বৃদ্ধি এবং জনসংযোগ মাধ্যমগুলির ব্যাপক প্রচার এর অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর হার কখনোই মোট আসনের তুলনায় ১০ শতাংশের অধিক হয়নি। পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় এই হার ১ শতাংশও নয়। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে সর্বাধিক ৭৩ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ২৯৪ জন বিধায়কের মধ্যে মহিলা বিধায়কের সংখ্যা মাত্র ২১ জন (প্রায় ৭%)। মহিলাদের এই অংশগ্রহণ থেকে তাদের ক্ষমতার অংশীদারে পরিণত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পায়।

অবশ্য বর্তমান পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে $\frac{১}{৩}$ অংশ আসনে মহিলা প্রতিনিধিত্ব করছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতার প্রথম কয়েক দশকের তুলনায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা ক্রমাগতভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন। তবে শুধুমাত্র নির্বাচনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণই বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার অংশীদারে পরিণত হওয়ার একমাত্র শর্ত নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে মহিলাদের অবস্থানের আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। রাজনৈতিক দলগুলিতে মহিলারা সাধারণভাবে পুরুষের অনুগামীতে পরিণত হয়। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন ঃ ৬। ***নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা করো। (Point out the arguments for and against woman's participation in politics and right to vote.)***

উত্তর ঃ গণতান্ত্রিক ধারণা বিকাশের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও দীর্ঘদিন ধরে নারীজাতিকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে একটি আইনের মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। ফ্রান্স এবং ইতালিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং জাপানে ১৯৪৭ সালে নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। যে সমস্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নারীজাতিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল তা

বিপক্ষে যুক্তি ঃ নারীজাতির ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি যুক্তি অবতারণা উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, ভোটাধিকার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু নারীরা প্রকৃতিগতভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য। জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়ে তারা পুরুষের তুলনায় সমকক্ষ নয়। পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুখী করে তোলা তাদের প্রাথমিক কর্তব্য। পারিবারিক জীবনকে অবহেলা করে, তারা যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে নারীর সুকুমার গুণগুলি নষ্ট হবে। সন্তান লালন-পালন করা তাদের প্রাথমিক কর্তব্য, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তারা নেমে এলে পারিবারিক জীবন বিপন্ন হবে।

প্রকৃতিগতভাবে অযোগ্য

দ্বিতীয়ত, নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে নারী যদি পুরুষের সঙ্গে একমত না হয় তাহলে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হবে। অন্যদিকে পুরুষের নির্দেশ অনুযায়ী তারা যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে নারীর ভোটাধিকারের কোনো প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে নারীজাতির মানসিক উৎকর্ষ না থাকার দরুন তারা পুরুষের নির্দেশে এই অধিকারটি প্রয়োগ করে।

পারিবারিক শান্তি নষ্ট হবে

তৃতীয়ত, নারীরা সাধারণত আবেগপ্রবণ হয় কিন্তু রাজনীতির মতো জটিল বিষয়ে আবেগপ্রবণতার কোনো স্থান নেই। রাজনীতিতে আবেগপ্রবণতা থাকলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এজন্য নারীজাতিকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়।

আবেগপ্রবণ

চতুর্থত, সমালোচকের মতে শারীরিক গঠনের দিক থেকে নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল প্রকৃতির হওয়ার জন্য দেশরক্ষার কাজে তারা অযোগ্য। দেশরক্ষা এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ না হওয়ার জন্য তারা পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে পারে না।

শারীরিক দিক হতে দুর্বল

পঞ্চমত, নারীজাতির ওপর ধর্মীয় প্রভাবের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। ক্যাথলিক প্রধান রাষ্ট্রগুলিতে পুরোহিতগণ সহজেই ধর্মীয় কারণে নারীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অধিকার করতে সক্ষম হন।

ধর্মভাবাপন্ন

সপক্ষে যুক্তি ঃ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি উল্লেখ করা হল সেগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গণতান্ত্রিক যুগে নারীর ভোটাধিকারের সপক্ষে একাধিক যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

প্রথমত, ন্যায় বিচারের যুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় আইন নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে স্পর্শ করে। এই কারণে সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত। নারীরা যদি প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না পায় তাহলে তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হতে পারে। এই কারণে **জন স্টুয়ার্ট মিল** নারীর ভোটাধিকারের সপক্ষে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন—What touches all must be decided by all।

দ্বিতীয়ত, শারীরিক দুর্বলতার কারণে নারীজাতিকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ এবং ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। নীতি ও যুক্তির ভিত্তিতেই ভোটাধিকার প্রদা

করা উচিত। ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য দৈহিক শক্তির প্রয়োজন নেই। এই যুক্তিতে দুর্বল পুরুষদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। প্রতিটি দেশেই দেশরক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে নারীজাতি পুরুষের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে নারীজাতির সংগ্রামের ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচার, ভারতের ইন্দিরা গান্ধি প্রমুখ নারীগণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দিক থেকে পুরুষ অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নয়।

তৃতীয়ত, নারীদের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হলে তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি কখনও নষ্ট হয় না। উপরন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হওয়ার জন্য তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে সুন্দর ও সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। নারীর ভোটাধিকারের ফলে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হবে—এই যুক্তি সম্পূর্ণ অচল।

চতুর্থত, নারীজাতিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে, তা হবে অগণতান্ত্রিক। সমাজে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলে সাম্যের নীতি উপেক্ষিত হবে। It is against the universal principles of equality and justice.

পঞ্চমত, ভোটাধিকারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীজাতি পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে নারীদের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা থাকার দরুন তারা গোপন নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকারকে প্রয়োগ করে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমানে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নারীর ভোটাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীজাতি পুরুষের সঙ্গে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা করে চলেছে। তাই কোনো যুক্তির ভিত্তিতে নারীজাতিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা অযৌক্তিক।

প্রশ্ন : ৭। ***ভারতে নারীদের জন্য সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।***
(Discuss on the policy of reservation for women in India.) *[C. U. 2006]*

উত্তর : পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় ভারতীয় সমাজে মহিলারা এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। সুদীর্ঘকাল ধরে মহিলারা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক হতে অনগ্রসর, শোষিত ও বঞ্চিত। প্রকৃত সাম্যপ্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য মহিলাদের সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় পার্লামেন্টে বিগত জনতা সরকারের আমলে মহিলাদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৮৪তম সংশোধনী বিল পেশ করা হয়। উক্ত বিলটি এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে। এই বিলের উল্লেখযোগ্য দিক হল—(১) আইনসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, (২) এই বিলে জাতিগত বিচার বা তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক সংরক্ষণের কথা হয়নি, (৩) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহ আবর্তনশীলতার নিয়ম অনুযায়ী পূরণ করা হবে। ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ (৩৩.৩৩ শতাংশ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। দেশের বিভিন্ন সংগঠনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের নীতিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

স্বপক্ষে যুক্তি : মহিলা বিলের পক্ষের প্রবক্তাগণ উল্লেখ করেন যে, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ফলে মহিলারা আইনসভায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সদস্যপদ লাভ করবেন। মহিলারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হবেন। প্রশাসন যন্ত্র ও সরকারি ব্যবস্থাকে নিজ স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োগ করতে পারবেন। আইনসভায় নারীদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব থাকলে নারীর অধিকার রক্ষা এবং পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রগতিশীল আইন প্রণীত হতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তি : ন্যায়নীতির যুক্তিতে নারীদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণকে সমর্থন করা হলেও এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন বক্তব্য রাখা হয়।

প্রথমত, সমালোচকগণ উল্লেখ করেন যে, সাংসদ হিসেবে সঠিক ভূমিকা পালনের জন্য যে গুণগত দক্ষতা, যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণ প্রয়োজন ভারতে অধিকাংশ মহিলার মধ্যে তা নেই। বর্তমানে দেখা যায় যে, মহিলা সাংসদগণ আইনসভায় বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না। এমনকি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা পুরুষের দ্বারা পরিচালিত হন।

দ্বিতীয়ত, উল্লেখ করা হয় যে, যে সমস্ত দল মহিলা বিলকে সমর্থন করেছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন নয়। মহিলা ভোটদাতাদের সন্তুষ্ট করে তাদের সমর্থন আদায় করাই প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক কাঠামোতে এবং প্রার্থী মনোনয়নে মহিলাদের সংখ্যা বিচার করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, সমালোচকদের মতে আইনসভায় মহিলাদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ পুনরায় দেশের মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করবে। তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ফলে সারা দেশে কৃত্রিম বিভাজন ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত জনসমষ্টির অবহেলিত অংশের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে কায়েমি স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংরক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

চতুর্থত, সমালোচকদের মতে প্রকৃত শিক্ষা এবং অর্থনীতিতে পরিবর্তন না ঘটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আইনসভায় মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে সাংসদ বা আইনসভার কর্মক্ষেত্রে গুণগত মানের অবনতি ঘটবে। তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের ফলে সমগ্র দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। গুণগত মানের অবনতি ঘটছে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হলে একই পরিণতি ঘটবে।

পঞ্চমত, কেউ কেউ মহিলা সংশোধনী বিলটি সংশোধনের পক্ষপাতী। তারা জাতি-উপজাতি এবং ধর্মীয় বিবেচনার ভিত্তিতে মহিলাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার দাবি করেন। লিঙ্গ, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে মহিলাদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ চালু হলে ভারতীয় সমাজের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়বে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতার অংশীদারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। আদর্শ ও মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে লিঙ্গ, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে নারীদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ চালু করলেই যে প্রকৃত নারী মুক্তি ঘটবে, তা প্রত্যাশা করা ঠিক নয়।